চার্বাক ও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ: জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারার বিশেষ কয়েকটা দিক

মোঃ জসিম খান*

Abstract

The philosophy of Charvaka and logical positivism are distinct with each other in terms of it's origin and development. However, there have been some common grounds that are exposed here with critical comments. This paper explores some epistemological aspects of both the philosophy where it overlapped with each other. Charvaka expresses that knowledge solely depends upon human perception; logical empiricism on the other hand expresses the same vibrant of thoughts. Besides, Charvaka is thought to be revolutionary revolts against authority on the other hand logical positivism is remarkably assisted by scientific philosophy which is also pondered as a revisionary in nature. Therefore, this paper examines some epistemological aspects of both the schools.

চার্বাক ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার মধ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী দর্শন। ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়গুলো তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনায় প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্যান্য বিষয়কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে স্বীকার করলেও শুধুমাত্র চার্বাক দর্শনই প্রত্যক্ষকে জ্ঞানের অন্যতম উৎস বলে মনে করে। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে। চার্বাক দর্শনকে অভিজ্ঞতা নির্ভর বস্তুবাদী দর্শন নামে অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ বিংশ শতাব্দীর প্রভাবশালী ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক দার্শনিক স্কুল, জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। চার্বাকদের মতো যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদেও জ্ঞানের অন্যতম উৎস হিসেবে অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার মধ্যে অত্যন্ত প্রাচীন, প্রতিষ্ঠান বিরোধী ও বৈপ্লবিক এই দর্শনের সাথে বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দার্শনিক চিন্তা বিশেষ করে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। এ দুটো দার্শনিক চিন্তার মধ্যে বিশেষ করে তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়ের সাদৃশ্য অনুধাবন করাই হবে এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

ভারতীয় দর্শনের নয়টি স্কুলই দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে জ্ঞানবিদ্যার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। তবে ভারতীয় জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা অবশ্যই পাশ্চাত্য দর্শনের জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা থেকে ভিন্ন। এমনকি ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রেও ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে চার্বাক দর্শন অন্যতম দার্শনিক সম্প্রদায় যারা জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে পৃথক। চার্বাক দর্শন চার্বাক জ্ঞানতত্ত্বের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।[১]

বৈধ জ্ঞানকে বলা হয় 'প্রমা' এবং বৈধ জ্ঞান লাভের উৎসকে বলা হয় 'প্রমাণ'।[২] চার্বাক দর্শন ছাড়া অন্য সব দার্শনিক সম্প্রদায় অধিক প্রমাণকে স্বীকার করেছে। শুধুমাত্র চার্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। তাঁদের মতে প্রত্যক্ষই জ্ঞানের

*সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

একমাত্র বৈধ উৎস। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ছাড়া কখনও নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। 'প্রমাণেষু প্রত্যক্ষং শ্রেষ্ঠং'[৩] অর্থাৎ প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। সকল ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায়ে প্রত্যক্ষ শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে বিবেচিত। চার্বাক সবচেয়ে বড় ভাববাদ বিরোধী সম্প্রদায় হওয়ায় জ্ঞানবিদ্যার আলোচনায় প্রত্যক্ষের গুরুত্ব সর্বাধিক। যেহেতু 'প্রমাণ' বলতে সম্যক জ্ঞানকে বুঝায় সেহেতু এ জ্ঞান সকল প্রকার সংশয় ও বিপর্যয়শূন্য জ্ঞান বলে বিবেচিত। চার্বাকরা মনে করেন একমাত্র প্রত্যক্ষের মাধ্যমেই সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। প্রত্যক্ষ ছাড়া কোনো বাস্তব জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। এজন্য চার্বাকরা প্রত্যক্ষকে একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বলে স্বীকার করেন।

চার্বাক দর্শন কেন প্রত্যক্ষের বাইরে আর কোনো কিছুকে সত্য মনে মেনে নেয়নি? এর উত্তরে ভাষ্যকার মণিভদ্র দুটি যুক্তির কথা বলেছেন। প্রথম যুক্তিটি হলো, মানুষকে ধর্মের প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা করা। ধর্মকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মনে স্বর্গ লাভের আশা সৃষ্টি করা ধর্ম ব্যবহারকারীদের অন্যতম কাজ। সাধারণ মানুষকে এই সংকট থেকে বাঁচতে হলে প্রত্যক্ষকে একমাত্র প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। মণিভদ্রের ভাষায়:

> এবম্ অমী অপি ধর্মচ্ছদ্মধূর্ততা: পরবঞ্চনপ্রবণা যৎ কিম্চিৎ অনুমানাগমাদিদার্ঢ্যম
> আদর্শ ব্যর্থম্ মুগ্ধজনান্ স্বর্গাদিপ্রাপ্তিলভ্যভোগাভোগ প্রলোভনয়া
> ভক্ষ্যাভক্ষ্যগম্যাগম্যহেয়োপাদেয়াদি সংকটে পাতয়ন্তি,
> মুগ্ধধার্মিকান্ধ্যম্ চ উৎপাদয়ন্তি... ।৪

দ্বিতীয় যুক্তিটিকে তিনি আরো বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ মণিভদ্র তাঁর দ্বিতীয় যুক্তির দ্বারা দারিদ্র ও দাসত্বের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা বলেছেন। মনিভদ্রের ভাষায়:

> কিম্চ অপ্রত্যক্ষম্ অপি অস্তিততয়া অভ্যুপগম্যতে চেৎ জগৎ অনহ্নুতম্ এব স্যাৎ,
> দরিদ্রঃ হি স্বর্ণরাশিঃ মে অস্তি ইতি অনুধ্যায় হেলয়া এব দৌঃস্থ্যম দলয়েৎ,
> দাস: অপি স্বচেতসি স্বামিতাম্ অবলম্ব্য কিংকরতাম্ নিরাকুর্য্যাৎ ইতি।...এবং ন
> কশ্চিৎ সেবা- সেবকভাব: দরিদ্রধনিভাব:বা স্যাৎ।৫

অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষকে সত্যের সম্ভাবনা দিলে দরিদ্রের পক্ষে তার দারিদ্র্যের কথা ভুলে যাওয়া, দাসের পক্ষে তার দাসত্বের কথা ভুলে যাওয়া সম্ভব হবে। এর কারণ হলো দরিদ্রের কাছে দারিদ্রটুকু এবং দাসের নিকট তার দাসত্ব প্রত্যক্ষ বলে বিবেচিত। অপ্রত্যক্ষকে অস্তিত্বের সম্ভাবনা দিলে দরিদ্রও নিজেকে 'স্বর্ণরাশির মালিক' হয়েছি মনে করতে পারে আর দাস নিজেকে দাস মনে না করে স্বামী মনে করে নিজের অসহায় অবস্থাকে অবহেলায় ক্ষতি করতে পারে। বলা যায় এভাবে দরিদ্র-ধনিভাব এবং সেব্য-সেবকভাব সব কিছুই নস্যাৎ হয়ে যায়। চার্বাক বা লোকয়িতকেরা প্রত্যক্ষকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেছে তার অন্যতম কারণ সাধারণ মানুষ যারা দরিদ্র ও দাস তারা যেন তাদের নিজেদের অবস্থান ভুলে না যায়। সমাজের শোষিত শ্রেণিকে সব সময় ভয় দেখানো হয় বিভিন্ন ধর্মীয় রীতি-নীতির কথা বলে। লোকায়িতকদের অন্যতম প্রচেষ্টা ছিল অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো বিষয়কে প্রাধান্য না দেওয়া। কারণ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ছাড়া সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, চার্বাক দর্শনই শুধু প্রত্যক্ষকে প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেছে তা কিন্তু নয় ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য সম্প্রদায়ও প্রত্যক্ষকে প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করে। তবে তাঁরা অন্যান্য প্রমাণের চেয়ে প্রত্যক্ষকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলে মনে করে।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে প্রত্যক্ষ বলতে আমরা কি বুঝি? প্রত্যক্ষ হলো প্রতি+অক্ষ।[৬] বাহ্য বস্তুর প্রতি চক্ষু-কর্ণ ইন্দ্রিয়াদির যে সম্বন্ধ তাই হলো প্রত্যক্ষ। লৌকিক মত অনুযায়ী প্রত্যক্ষকে চাক্ষুস জ্ঞানের প্রকাশ বলে মনে করা হলেও দার্শনিক পরিভাষায় এর অর্থ ভিন্ন। পাঁচটি ইন্দ্রিয়কেই সাধারণভাবে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা হয়। আমাদের যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে এগুলোর মধ্যে যে কোনো একটির সাহায্যেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাক্ষাত পাওয়া সম্ভব। যদিও চক্ষু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অন্যতম তবুও কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক- এদের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব। অর্থাৎ বলা যায় চার্বাক মতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলোর সাথে বাইরের কোনোবস্তুর সরাসরি যোগাযোগের ফলে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। যদিও অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলো প্রত্যক্ষের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সেজন্য প্রত্যক্ষ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে সব সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বীকৃত। একথা বলা চলে যদিও প্রত্যক্ষকে প্রধান প্রমাণ বলে মানা হয় তবে প্রত্যক্ষ দ্বারা সব সময় একই বিষয়কে বুঝানো হয় না। ভারতীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে এ বিষয় নিয়ে নানা মতপার্থক্য বিদ্যমান। প্রাচীন ন্যায় দার্শনিক উদ্দয়ঠাকুরের মতে, "আক্ষরিক অর্থে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যা সম্পর্কিত তাকেই প্রত্যক্ষের বিষয় বলা যাবে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কোনো কিছুর সম্পর্ক বা সন্নিকর্ষ ঘটলেই তা প্রত্যক্ষ।"[৭] অন্যদিকে, বৈশেষিক দার্শনিক প্রশস্তপদ মনে করেন, "প্রত্যক্ষের উপর কোনো বিষয় নির্ভরশীল হলে তার জ্ঞানই প্রত্যক্ষ।"[৮] ন্যায়সূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে– 'ইন্দ্রিয়ার্থসন্নি- কর্ষোৎপন্ন জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্'[৯] অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সে ধরনের জ্ঞান যা ইন্দ্রিয় এবং অর্থ বা জ্ঞেয় বস্তুর সন্নিকর্ষের কারণে উৎপন্ন হয়।

লোকায়তিকরা সম্যক অপরোক্ষ অনুভবকে প্রত্যক্ষ বলেছেন। অতএব প্রত্যক্ষ দুপ্রকার– বাহ্য ও মানস।[১০] পঞ্চইন্দ্রিয় তথা চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক-এর দ্বারা বাইরের বস্তুর সাথে সরাসরি সংযোগের ফলে যে প্রত্যক্ষ লাভ হয় সেটা বাহ্য প্রত্যক্ষ। আর মনের সাহায্যে সুখ, দুঃখাদির যে সাক্ষাত অনুভূত হয় সেটা হলো মানস প্রত্যক্ষ। বাহ্য প্রত্যক্ষ থেকে মন বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে বলে মানস প্রত্যক্ষ এর ওপর নির্ভরশীল থাকে। চার্বাকরা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের কথা বলেছেন, তা এতই স্পষ্ট যে, এর যথার্থতা নিয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। চার্বাকরা বিশ্বাস করে যা কিছু সত্য তা অবশ্যই প্রত্যক্ষগোচর। প্রত্যক্ষের বাইরের কোনো জ্ঞানকেই সংশয়াতীত বা নিঃসন্দিগ্ধ বলা যায় না। প্রত্যক্ষই যে চার্বাক দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এ কথা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই, আর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণের মূল্য নেই। চার্বাকরা অভিজ্ঞতাকে শক্তিশালী প্রমাণরূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনুমান ও শব্দকে প্রমাণরূপে মেনে নেয়নি। বরং অনুমান ও শব্দকে প্রমাণ হিসেবে না মানার পেছনে চার্বাকরা জোরালো যুক্তির অবতারণা করেছেন, যা তাদের একমাত্র প্রমাণ প্রত্যক্ষকে আরো শক্তিশালী প্রমাণের মর্যাদায় উন্নীত করেছে।

চার্বাক দর্শন অনুমানকে যথার্থ প্রমাণ বলে স্বীকার করেনা। কেননা অনুমান সবসময় যথার্থ ও নিশ্চিত জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। চার্বাকরা মনে করেন অনুমানলব্ধ জ্ঞান সম্ভাব্যমাত্র। এ মতের সমর্থন পাওয়া যায় মাধবাচার্য ও হরিভদ্রের আলোচনা থেকে। চার্বাকরা যে অনুমানের বিরোধী এ বিষয়টাকে বাচস্পতি মিশ্র নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করেছেন। এক কথায় তিনি চার্বাকদেরকে গালি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। বাচস্পতি বলেছেন "চার্বাক

প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোনো প্রমাণই মানে না। তাই তার অবস্থা জানোয়ারের ও বেহদ্দ। জানোয়ারেরাও হিত-প্রাপ্তি ও অহিত-পরিহারের ব্যপারটা বোঝে, কিন্তু বুঝতে গেলে অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়।"[১১] অর্থাৎ চার্বাকরা প্রত্যক্ষের বাইরের আর কোনো কিছু এমনকি অনুমানকেও স্বীকার করে না, চার্বাকদের এই কঠোরতার কথা বাচস্পতি বলতে চেয়েছেন। অনেক ভারতীয় দার্শনিকরা বলেছেন যে, চার্বাকরা প্রত্যক্ষ ছাড়া আর কোনো প্রমাণ মানে না সেজন্য তাদের কাছে অনুমান কোনো প্রমাণ নয়। মাধবাচার্যের রচনায় চার্বাক সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তা বাচস্পতি মিশ্রের মনোভবের সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা। মাধবাচার্যও বলতে চেয়েছেন যে, "চার্বাকরা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে মানেন; অতএব তাঁদের মতে অনুমানের প্রামাণ্য নেই, বা সোজা কথায়, অনুমান বলে কোনো প্রমাণ হয় না"।[১২]

ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলো বিশেষ করে ন্যায়, মীমাংসা, বেদান্ত, জৈন, বৌদ্ধ দর্শনেও অনুমানকে প্রমাণ হিসেবে মেনে নিয়েছে যদিও অনুমান সম্পর্কে তাদের ভিন্ন মতের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুমানের প্রকারভেদ ও অবয়ব নিয়ে সব দার্শনিক সম্প্রদায় একমত না হলেও তাঁরা সবাই মনে করেন অনুমান প্রক্রিয়া ব্যাপ্তি জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। এখন স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে অনুমান বলতে আমরা কি বুঝি? 'অনুমান' শব্দটির দুটি অংশ আছে, অনু+মান। অনু শব্দের অর্থ পরবর্তী আর মান শব্দের অর্থ জ্ঞান। অর্থাৎ অনুমান বলতে 'প্রত্যক্ষের পরবর্তী' জ্ঞানকে বুঝায়। "অতএব, আজকাল যদিও চলতি কথায় আমরা 'অনুমান'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ইংরেজি ইন্‌ফারেন্‌স্ (Inference) শব্দের ব্যবহার করে থাকি, তবুও মনে রাখা দরকার যে ভারতীয় ঐহিত্য অনুসারে 'অনুমান' জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অনুগামী পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল।"[১৩] তাহলে সহজেই বলা যায়, প্রত্যক্ষের পরবর্তী প্রমাণ হিসেবে বিভিন্ন সম্প্রদায় অনুমানকে স্বীকার করে থাকে। জৈমিনিসূত্রের খ্যাতনামা ভাষ্যকার শবরস্বামী অনুমানের সংজ্ঞা দিয়ে বলেন যে, "প্রত্যক্ষিত কোনো বস্তু থেকে এ বস্তুর সঙ্গে স্থায়ী বা নিয়ত ঐক্য সম্পর্কের জ্ঞানের ভিত্তিতে অপ্রত্যক্ষিত কোনো বস্তুর জ্ঞানকে অনুমান বলে।"[১৪] সাধারণভাবে বলা যায়, কোনো জানা সত্য থেকে অজানা সত্যে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াই হলো অনুমান।

চার্বাকরা অনুমানকে কেন প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না এই বিষয়টা মাধবাচার্য ও অন্যান্য দার্শনিকদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলোচনা করা যায়। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মাধবাচার্যের অনুমান খণ্ডন সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে কিছু দৃষ্টান্তের কথা বলেছেন, "অনুমানের সবচেয়ে প্রচলিত দৃষ্টান্ত হলো: পাহাড়ে ধুঁয়ো দেখে জানা গেল ওখানে আগুন আছে। আগুনটা জানলাম অনুমান করে। এই অনুমানে তিনটি পদ আছে: ধূম, অগ্নি, পর্বত। ভারতীয় পরিভাষায়–

'ধূম' হলো 'হেতু' বা 'লিঙ্গ'
'অগ্নি' হলে 'সাধ্য'
'পর্বত' হল 'পক্ষ'।"[১৫]

অনুমান সবসময় হেতু (ধূম) ও সাধ্য (অগ্নি) এ দুটির ব্যাপ্তি সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে হয়। 'হেতু' ও সাধ্যের নিয়ত, অব্যভিচারী সম্বন্ধ হলো ব্যাপ্তি। 'ব্যাপ্তি' ছাড়া কখনও অনুমান সম্ভব নয়। তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে ধূম (হেতু) থেকে পর্বতে (পক্ষতে) অগ্নির (সাধ্যর)

অনুমান করা আদৌ সম্ভব কী করে? কারণ, ধূমের সাথে অগ্নির অর্থাৎ, হেতুর সাথে সাধ্যের নিয়ত সম্বন্ধ জানা থাকলেও কোনো ব্যতিক্রম জানা নেই। ব্যাপ্তিজ্ঞান তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারব যে, ধূম থাকলে অবশ্যই অগ্নি থাকবে। সুনিশ্চিতভাবে এ কথা বলা যায় না। মাধবাচার্য বলেন, চার্বাকরা মনে করে 'ব্যাপ্তি' প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় কারণ 'ব্যাপ্তি' স্থাপনের জন্য সকল 'উপাধির' সম্ভাবনা দূর করা প্রয়োজন। উপাধি বলতে শর্তকে বুঝানো হয়, যেমন যদি বলা হয় যেখানেই অগ্নি থাকবে সেখানেই ধূম থাকবে তাহলে তপ্ত লৌহদণ্ডেও ধূম থাকার কথা। আবার ভিজে কাঠে আগুন ধরালে ধূয়া থাকে, এক্ষেত্রে ভিজে কাঠের দৃষ্টান্ত হবে উপাধি। মাধবাচার্য 'নিশ্চিত' ও 'শংকিত' নামে চার্বাকদের দু'ধরনের উপাধির কথা বলেছেন। যে বিষয়টিকে আমরা জানতে পারি সেটা নিশ্চিত উপাধি আবার এমন উপাধিও থাকতে পারে যার সম্পর্কে আমরা জানতে পারি না সেটাকে শংকিত উপাধি বলে। এই দুই ধরনের সম্ভাবনা দূর করা যায় না বলে ব্যাপ্তি জ্ঞান সম্ভব নয় আর ব্যাপ্তি জ্ঞান সম্ভব না হলে অনুমানও সম্ভব নয়। চার্বাকরা অনুমানকে খণ্ডন করেছেন এ কথা হরিভদ্রের রচনায় পাওয়া যায়। হরিভদ্র বলেছেন,

লোকায়তা বদন্ত্যেবং নাস্তি দেবো ন বির্বৃতিঃ।
ধর্মাধর্মৌন বিদ্যোত ন ফলং পূণ্যপাপয়োঃ।
এতাবানের লোকোইয়ং যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ।
ভদ্রে বৃকপদং পশ্য যদ্বদন্তি বহুশ্রুতাঃ॥[১৬]

অর্থাৎ লোকায়িতরা বলেন দেবতা, মোক্ষ, ধর্ম-অধর্ম ও পাপ পূণ্য বলে কোনো কিছুই নেই। যা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর শুধু সেটুকুই সত্য। মহাপণ্ডিতেরা নেকড়ের পায়ের পদচিহ্ন দেখে কী বলেন সে কথাও ভেবে দেখ। হরিভদ্রের রচনার ব্যাখ্যাকার গুণরত্ন এই বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। পণ্ডিত ব্যক্তিরা পাপ-পুণ্য/স্বর্গ-নরক প্রাপ্তির কথা বলে সাধারণ মানুষের মনে ভয়ের সঞ্চার করে তাদেরকে ঠকান। মহাপণ্ডিতেরা এসব কর্মকাণ্ড করে অনুমান ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে। চার্বাকরা পরকাল, ঈশ্বর প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ বিষয় যা সরাসরিভাবে জানা যায় না এসব বিষয়ের আলোচনাকে অসার মনে করেন। হরিভদ্র তাঁর রচনায় এভাবে চার্বাকদের অনুমান বিরোধী বক্তব্যের কথা তুলে ধরেন।

চার্বাকরা প্রত্যক্ষকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনুমানের পাশাপাশি শব্দকেও যথার্থ প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে শব্দ কখনও যথার্থ প্রমাণ হতে পারে না কেননা শব্দ অনুমান-নির্ভর। শব্দ বলতে আমরা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন বা শাস্ত্রীয় বচনকে বুঝে থাকি। কোনো ব্যক্তির ভালো আচরণ বা উত্তম চরিত্রের গুণাবলি থেকে আমরা তাকে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি বলে মনে করতে পারি। এই বিশ্বাসযোগ্যতার বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুমান নির্ভর। অনুমান নির্ভর হয়ে কোনো বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির উপদেশ বা নির্দেশ শুনে কোনো কাজে সফল হলেও চার্বাকরা ঐ ব্যক্তির বচনের উপর নির্ভর করার পক্ষপাতি নয়। বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি যখন কোনো অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের কথা বলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না, কেননা সেটা অনুমান নির্ভর। চার্বাকরা যেহেতু অনুমানকে স্বীকার করে না সেহেতু অনুমান নির্ভর শব্দকে তারা যথার্থ প্রমাণ বলে মানেন না। চার্বাক সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্যকেও অস্বীকার করে। ধূর্ত পূজারীরা অজ্ঞ ও সরল জনসাধারণকে প্রতারণা করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য বেদ রচনা করেছেন।[১৭] অর্থাৎ ভণ্ড ও ধূর্ত ব্রাহ্মণগণ সহজ সরল

লোকদেরকে ধর্মের ভয় দেখিয়ে জীবিকা অর্জনের সহজ পথ বেছে নিয়েছিলেনে। "ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ডধূর্ত নিশাচরাঃ" অর্থাৎ ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচার ব্যক্তিদের দ্বারা বেদ রচিত হয়েছে। চার্বাকরা বেদের বাণীকে অলীক বা কল্পনাপ্রসূত বলে মনে করেন যা কখনও সঠিক হতে পারে না। এজন্য বেদকে প্রমাণরূপে স্বীকার করা নিরর্থক। যথার্থ ও নিশ্চিত জ্ঞানের উৎস হিসেবে চার্বাকরা একমাত্র প্রত্যক্ষকেই স্বীকার করেন। অনুমান ও শব্দ সঠিক জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারে না বলেই তা জ্ঞানের উৎস হতে পারে না।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একটি শক্তিশালী ও আলোচিত দার্শনিক চিন্তাধারার জন্ম হয়, যা যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ নামে পরিচিত। যদিও পূর্বে প্রত্যক্ষবাদ প্রত্যয়টির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় অগাস্ট কোঁতের সমাজ চিন্তায়। অগাস্ট কোঁত প্রত্যক্ষবাদী চিন্তার মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তবে এ কথা বলা যায় যে, অগাস্ট কোঁতের প্রত্যক্ষবাদের সাথে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের সরাসরি যোগাযোগ না থাকলেও প্রত্যক্ষবাদের সাথে যৌক্তিক বিশ্লেষণের সংমিশ্রণ ঘটেছে সাম্প্রতিককালে। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকেরা যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানভাবাপন্ন হয়ে নতুন পদ্ধতিতত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত করেন, যা দর্শনের ইতিহাসে আলোচিত ঘটনা হিসেবে পরিচিত। তাঁদের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, "তাঁরা অতীতের অনুধ্যানিক (Speculative) ও সিস্টেমভিত্তিক দার্শনিক ঐতিহ্যের বিরোধী, এবং অগ্রসরমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের খাতিরে প্রধানত ভাষার অর্থ পরিষ্করণে আগ্রহী।"[১৮] দার্শনিক চিন্তাকে বিজ্ঞানের মতো নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তাঁরা অভিজ্ঞতার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেন। আর অধিবিদ্যার জ্ঞান যেহেতু অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না সেহেতু দর্শনের আলোচনা থেকে অধিবিদ্যার সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়কে ত্যাগ করতে হবে। অনেক বিখ্যাত দার্শনিক এ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে থাকেননি বটে, কিন্তু তাঁদের মতাদর্শ জ্ঞানের জগতে নতুন চেতনার সৃষ্টি করেছিল। মতিউর রহমান তাঁদের অবদান সম্পর্কে বলেন–

> এ এমন একটি দার্শনিক আন্দোলন, যার মধ্যে ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬)-এর অভিজ্ঞতাবাদ অগাস্ট কোঁতে (১৭৯৮-১৮৫৭) ও আর্নস্ট ম্যাক (১৮৩৮-১৯১৬)-এর দৃষ্টবাদ, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্জ এডওয়ার্ড ম্যুওর (১৮৭৩-১৯৫৮), বার্ট্র্যান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০), লুডভিগ ভিটগেনস্টাইন (১৮৮৯-১৯৫১), এ.এন. হোয়াইটহেড (১৮৬১-১৯৪৭) এবং গেটলব ফ্রেগ (১৮৪৮-১৯২৫) প্রমুখ দার্শনিক দ্বারা অনুসৃত ও অনুশীলিত নৈয়ায়িক বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Method of Logical Analysis)-এর এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তাই এ মতবাদ একদিকে যতটুকু বিজ্ঞানপ্রিয়, অন্যদিকে ততটুকু বিশ্লেষণধর্মী।[১৯]

অর্থাৎ যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী আন্দোলনের সাথে উপর্যুক্ত দার্শনিকবৃন্দ সরাসরি সম্পৃক্ত না থাকলেও এ দর্শনের অনেক রসদ ও সমর্থন যুগিয়েছেন তাঁরা তাঁদের দার্শনিক আলোচনার মাধ্যমে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে একদল পদার্থবিদ, গণিতবিদ, অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ নামে একটি দার্শনিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনের

অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দর্শন থেকে সবধরনের অধিবিদ্যক আলোচনাকে বাদ দিয়ে অভিজ্ঞতা নির্ভর জ্ঞানার্জন করা। তাঁরা চেয়েছিলেন, ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো সমস্যার অর্থপূর্ণ সমাধান করতে। বলা হয়ে থাকে আর্নস্ট মাখ্ প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের সূচনা করেন। ভিয়েনাতে মাখ এসেছিলেন অভিজ্ঞতাবাদী ধারাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে।[২০] "মাখ মনে করতেন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে এমন হতে হবে যেন তাকে আমরা অভিজ্ঞতামূলক তথ্যে পর্যবসিত করতে পারি, যেন তা আধিবিদ্যাক বিষয় থেকে মুক্ত হয় এবং পরিণামে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়।"[২১] তিনি ভেবেছিলেন দর্শনকে যদি শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড়াতে হয়, তবে অবশ্যই বাস্তবমুখী, তাৎপর্যপূর্ণ বিজ্ঞান চর্চা করতে হবে। বলা যায় মাখের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী আন্দোলনের প্রেরণা ছিল।

বিশ শতকের প্রথমদিকে বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী ও দার্শনিক মরিজ শ্লিক ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে আসার পর তাঁকে ঘিরে ভিয়েনা চক্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুর দিকে এটি আন্দোলনের পরিবর্তে ক্লাব হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিল। এটি ক্লাবের সদস্যদের কাছে মুক্তচিন্তার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। মরিজ শ্লিক ছাড়াও এ চক্রের অন্যান্য সদস্য ছিলেন আর্নস্ট মাখ্, অটো নিউর‍্যাথ, হ্যান্স রাইখেনবার্গ, রূডলফ কার্নপ, হারবার্ট ফাইগল ও ফিলিপস্ ফ্রাঙ্ক। "ভিয়েনা সার্কেল কর্তৃক প্রদত্ত কতিপয় দার্শনিক মতামতকে ১৯৩১ সালে এ.ই. লুমবার্গ ও হার্বার্ট ফেইগল যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ নামে অভিহিত করেন।"[২২]

ক্রমে ভিয়েনা চক্রের জনপ্রিয়তা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাবিদেরা তাঁদের সাথে যোগ দেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এ আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপিত হতে থাকে। প্র্যাগ, ওয়ার্‌স এমনকি জার্মানীর বার্লিনে এর একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এ.জে.এয়ার ইংল্যান্ডে এ মতের একমাত্র প্রবক্তা ছিলেন। ভিটগেনস্টাইন যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী আন্দোলনের সাথে সরাসরি জড়িত না থাকলেও এ আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল। ভিটগেনস্টাইনের মৌলিক গ্রন্থ *ট্রাকটেটাস লজিকো–ফিলোসপিকাস* থেকে তাঁরা এ আন্দোলনের মূল প্রেরণা পেয়েছিলেন যা তাঁদের দার্শনিক মত প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করেছিল। এছাড়া পূর্বে ডেভিড হিউম যে দার্শনিক চিন্তার কথা বলেছেন তার মধ্যে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের আন্দোলনের সূত্রটা লুকায়িত ছিল বলে ধারণা করা হয়। এয়ারের ভাষায়, সমসাময়িক দার্শনিকদের বাইরে যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিয়েনা সার্কেলের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে কাছাকাছি তাঁরা হলেন ডেভিড হিউম এবং আর্নস্ট্ মাখ।[২৩] যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা বাক্যের অর্থ নির্ণয়ের কথা বলেছেন। মানুষ তার ভাষার অর্থ বচনের মাধ্যমে প্রকাশ করে। বচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বচন সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। একটি বচন তখনই অর্থপূর্ণ হবে, যখন সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। বচনের সত্যতার বা মিথ্যাত্বের উপর এর যথার্থতা নির্ভর করে। অর্থাৎ যে বচন সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না তার জ্ঞানীয় অর্থও নেই। মনে রাখা দরকার যে, বচন ও বাক্য সমার্থক নয়, কারণ কিছু বাক্যকে সত্য বা মিথ্যা প্রতিপাদন করা যায় না। যেমন, আদেশ বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্য এর আওতাভুক্ত।[২৪]

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা দুই ধরনের অর্থপূর্ণ বচনের কথা বলেছেন, সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক বচন। সংশ্লেষক বচন অভিজ্ঞতা নির্ভর। অর্থাৎ যেসব বচনের সত্যতা ও মিথ্যাত্বতা নির্ণয়ের জন্য অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয়, তাকে সংশ্লেষক বচন বলে। এসকল বচন সব সময় যাচাই বা পর্যবেক্ষণ নির্ভর হয়ে থাকে, যেমন 'গোলাপ হয় লাল', 'বাইরে বৃষ্টি

হচ্ছে', এই সব বচন অভিজ্ঞতা নির্ভর। বিশ্লেষক বচনকে অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষভাবে জানা যায়। যেসব বচনের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নির্ণয়ের জন্য অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করতে হয় না বরং উদ্দেশ্যের মধ্যেই বিধেয় নিহিত থাকে তাকে বিশ্লেষক বচন বলে, যেমন 'সব কুমার অবিবাহিত', 'ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান', এই বচনগুলো অভিজ্ঞতাপূর্ব। বিশ্লেষক বচনের জ্ঞান পূর্বতসিদ্ধ এবং সংশ্লেষক বচনের জ্ঞান হল পরতসাধ্য। অধিবিদ্যক বচনগুলোকে কোনোভাবেই সত্য বা মিথ্যা বলে নির্ণয় করা যায় না। এসব বচনকে না পূর্বতসিদ্ধ বিশ্লেষক না পরতসাধ্য সংশ্লেষক বচনের পর্যায়ভুক্ত করা যায়। এজন্য অধিবিদ্যার উক্তিগুলোকে সত্য বা মিথ্যা বলে নির্ধারণ করা যায় না বলে এর আলোচনা অর্থহীন। এঁদের আন্দোলন সম্পর্কে বলা যায়–

> বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও যথার্থই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হিসেবে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এঁরা দুটো মৌলিক উপায় উপস্থাপন করেছেন। এর একটি হলো: বিজ্ঞানকে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের আওতার বাইরের বিষয় থেকে, অর্থাৎ আধিবিদ্যক (Metaphysical) বিষয় থেকে মুক্ত রাখা। দ্বিতীয়ত, এ উপায় সাধনের জন্যে পরখ নীতির প্রয়োগ।[২৫]

মরিজ শ্লিকের পরখনীতি সম্পর্কিত আলোচনার সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় তার "মিনিং এন্ড ভেরিফিকেশন" (১৯৩৬) প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধে পরখনীতির সম্পর্কে তিনি বলেছেন–

> একটি বাক্যের অর্থ বর্ণনা করা এবং ব্যাখ্যাটি যে বিধি বা বিধিসমূহ (rules) অনুসারে ব্যবহৃত হয় তা বর্ণনা করা একই কথা, এবং এটা এও প্রকাশ করে যে, বাক্যটিকে কীভাবে প্রতিপাদিত (অথবা মিথ্যায়িত) (verified or falsified) হিসেবে বর্ণনা করা যায়। একটি বচনের অর্থ হলো তার যাচাইকরণের পদ্ধতি। (the meaning of a proposition is the method of its verification.)... এটা স্পষ্ট যে একটি বাচনিক সংজ্ঞাকে বুঝতে হলে আমাদেরকে পূর্ব হতেই (beforehand) শব্দের ব্যাখ্যার অর্থ জানতে হবে, এবং একমাত্র ব্যাখ্যা যার ক্ষেত্রে আমাদের প্রাক-জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না তা হলো প্রদর্শনমূলক সংজ্ঞা (ostensive definition)। আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, প্রদর্শনমূলক সংজ্ঞাকে চূড়ান্তভাবে নির্দেশ না করতে পারলে আমরা অর্থ কী তা বুঝতে পারবো না, এবং স্পষ্ট অর্থে, এ কথার অর্থ হলো 'অর্থ' নির্দেশ করে কোনো অভিজ্ঞতাকে অথবা অভিজ্ঞতার 'সম্ভাব্যতা'কে।[২৬]

এ.জে.এয়ার তাঁর *ল্যাংগুয়েজ, ট্রুথ এন্ড লজিক* বইটিতে পরখনীতি সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন যা যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের কাছে অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। এই বইয়ে তিনি মরিজ শ্লিক অপেক্ষা ভিন্ন পরখনীতির আলোচনা করেন। এয়ার 'ব্যবহারিক' ও 'নীতিগত' এবং 'সবল' ও 'দুর্বল' পরখযোগ্যতার কথা বলেন। বাস্তব পরিস্থিতিতে পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যখন কোনো উক্তিকে পরখ করা যায় তখন তাকে ব্যবহারিক

পরখযোগ্যতা বলে। যখন কোনো উক্তিকে বাস্তব পরিস্থিতিতে যাচাই করা যায় না তবে ঐ পরিস্থিতিতে কখনও অবস্থান করতে পারলে পরখ করা যেতে পারে তখন তাকে নীতিগত পরখযোগ্যতা বলে, যেমন চাঁদের অপর পাশে ৩,০০০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট পাহাড় আছে। এটা নীতিগত পরখযোগ্যতার বিষয় কারণ এটাকে সরাসরি পরখ করা না গেলেও নীতিগতভাবে পরখ করা যায়। এয়ার তাঁর *ল্যাংগুয়েজ, ট্রুথ এন্ড লজিক* (১৯৫২) গ্রন্থে বলেন–

> এমন কোনো রকেট এখনও আবিস্কৃত হয়নি যার সাহায্যে আমি চাঁদের অপর পৃষ্ঠে গিয়ে তার দিকে তাকাতে পারি, অতএব, বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমি এই বিষয়টি সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। কিন্তু আমি জানি কোনো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমি একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারতাম যদি আমি সেই পরিস্থিতিতে অবস্থান করতাম, সে বিষয়ে আমার তত্ত্বগত ধারণা আছে। এবং এ কারণেই আমি বলছি যে, বচনটি ব্যবহারিকভাবে পরখযোগ্য না হলেও নীতিগতভাবে পরখযোগ্য বলেই তা অর্থপূর্ণ।[২৭]

সবল অর্থে একটি উক্তি পরখযোগ্য হবে তখনই যখন এর সত্যতা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরখ করা যায়। কোনো 'উক্তিকে' যখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সম্ভাব্যরূপে প্রতিপাদন করা যায় তখন তাকে দুর্বল অর্থে পরখযোগ্যতা বলে। এয়ার 'নীতিগত পরখযোগ্যতা' এবং দুর্বল অর্থে পরখযোগ্যতাকে গ্রহণ করেছেন।[২৮] মরিজ শ্লিকের 'সবল' অর্থে পরখনীতিকে গ্রহণ করলে বিজ্ঞানের অনেক বিষয় ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। এজন্য এয়ার 'দুর্বল' অর্থে পরখনীতিকে গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে এয়ার আবার দুই ধরনের 'প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ' পরখযোগ্যতার মধ্যে পার্থক্য করেন। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক নীতিটিকে শক্তিশালী কাঠামোর উপর দাঁড় করানোর জন্য পরবর্তীতে নীতিটির কিছুটা পরিবর্তন করেন এবং চেষ্টা করেন তাদের নীতিটিকে নির্ভুলভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

চার্বাক দর্শন ও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের মূল বক্তব্যের মধ্যে বিরোধ নেই, এ বিষয়টা এখানে দেখানোর চেষ্টা করব। চার্বাকরা শুধুমাত্র অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকেই প্রকৃত জ্ঞান বলে থাকে। অভিজ্ঞতার বাইরের কোনো জ্ঞান নিশ্চিত বা প্রকৃত জ্ঞান নয়। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী আন্দোলনেরও অন্যতম লক্ষ হলো অভিজ্ঞতা নির্ভর জ্ঞান অর্জন করা। "তাদের উদ্দেশ্য ছিল নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়ায় তাঁরা নির্ভর করেন যৌক্তিক যুক্তিবিন্যাস (Logical Reasoning) এবং অভিজ্ঞতার উপর।"[২৯] চার্বাক সম্প্রদায়ের যেমন লক্ষ ছিল প্রত্যক্ষের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান অর্জন করা তেমনি যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরাও যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ভারতীয় বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ছাড়াও অনুমান ও শব্দকে যথার্থ জ্ঞানের উৎস হিসেবে মেনে নিলেও চার্বাকরা প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ বলে মানেন। চার্বাকদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রে কঠোর অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা মনে করেন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের বাইরে কোনো সঠিক জ্ঞান পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। লোকায়িতরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকেই প্রকৃত জ্ঞানের জগত বলে স্বীকার করেন।

ষড়দর্শনসমুচ্চয় ও কমলশীলের *তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকা* থেকে জানা যায়– "এতাবানেব লোকোইয়ং যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ। - এতাবানেব পুরুষো যাবানিন্দ্রিয় গোচরঃ"[৩০] অর্থাৎ চার্বাকদের মতে এই ইন্দ্রিয়গাহ্য জগতই বিবেচ্য, ইন্দ্রিয়ের বাইরে কোনো জগতকে তাঁরা স্বীকার করেননি।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা বিমূর্ত তত্ত্বানুসন্ধানের পরিবর্তে দর্শনের জ্ঞানকে বিজ্ঞানের মত বাস্তবতার উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেন বিজ্ঞানের এই বাস্তবজ্ঞান পাওয়া সম্ভব অভিজ্ঞতা নির্ভর জ্ঞানের মাধ্যমে। যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদীরা বিজ্ঞানের মতো নিশ্চয়তার জ্ঞান দর্শনেও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এজন্য বিজ্ঞানের জ্ঞানের সাথে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রাচীন ভারতীয় রসায়নবিদ্যা তথা আয়ূর্বেদ চিকিৎসার সাথে চার্বাকদের যোগাযোগ ছিল। একারণে বলা যায়, চার্বাকরা বিজ্ঞানভাবাপন্ন ছিলেন। চরক-সংহিতার একটা উদ্ধৃতির মাধ্যমে এই বিষয়টি সম্পর্কে জানা যায়–

স চ এব ভিষজং শ্রেষ্ঠঃ রোগেভ্যঃ যঃ প্রমোচয়েঃ॥
সম্যক্-প্রয়োগং সর্বেষাং সিদ্ধিঃ আখ্যাতি কর্মনাম্।
সিদ্ধিঃ আখ্যাতি সর্বৈঃ চ গুণৈঃ যুক্তং ভিষক্তমম্॥[৩১] (১।১।১৩৪-৫)

ডাক্তার ভালো না মন্দ সেটা বুঝা যাবে তার কর্মদক্ষতার দ্বারা। এভাবে ডাক্তার ও ডাক্তারির কদর বোঝা যাবে রোগীর রোগ সারানোর সফলতার উপর। অর্থাৎ কর্মজীবনের সফলতা থেকে বোঝা যায়, কোনো কথার গুরুত্ব কতটুকু। একথা সহজে বোঝা যায় যে, চার্বাকরা বিজ্ঞান ভাবাপন্ন ছিল যেমনটি লক্ষ করা যায় অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের ক্ষেত্রে।

চার্বাক ও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের দার্শনিক মতের আলোচনা থেকে আমরা তাঁদের সম্পর্কে আরও একটা বিষয়ের মিল দেখতে পাই। উভয় দার্শনিক সম্প্রদায় প্রচলিত ধর্মে-কর্মের আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তাঁরা স্বর্গ, মুক্তি, ও পরলোকগামী আত্মাকে স্বীকার করে না। চার্বাকদের এই বক্তব্যটা একটা শ্লোকে উদ্ধৃত হয়েছে–

ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
অগ্নিহোত্রংত্রয়ো বেদাস্ত্রিদন্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধি পৌরুষহীনানং জীবিকা ধাতৃনির্মিতা॥[৩২]

অন্যদিকে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা দর্শন থেকে সব ধরনের অধিবিদ্যক বিষয়গুলোকে বর্জন করার কথা বলেছেন। তাঁদের মতে অতীন্দ্রিয় কোনো বিষয়কে জানা যায় না। এয়ারের মতে, "অধিবিদ্যক বাক্যের তথ্যকে তথ্য বলা যায় না। কারণ আধিবিদ্যক বাক্যের তথ্য প্রায়োগিকভাবে পরখযোগ্য নয়। যা স্বতঃসত্য নয় আবার পরখেরও অযোগ্য, তাদেরকে আর যাই বলা যাক না কেন, বাক্য বলে অভিহিত করা যায় না।"[৩৩] অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে সকল বিষয়ের জ্ঞান পাওয়া সম্ভব নয় তার অস্তিত্বের কল্পনা অর্থহীন, এ অর্থে ঈশ্বরের ধারণা যেহেতু অতীন্দ্রিয় বিষয় সেহেতু তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না।

চার্বাকদের সাথে প্রত্যক্ষবাদীদের একটা অন্যতম মিল হলো- প্রত্যক্ষবাদীরা যে নীতির কথা বলেন তা অত্যন্ত কঠোর হওয়ায় বিজ্ঞানের অনেক বিষয় বাদ পড়ে যায়, এজন্য পরবর্তীতে তাঁরা তাঁদের নীতির কিছুটা পরিবর্তন আনেন, ঠিক এমনিভাবে পরবর্তিকালের চার্বাক দার্শনিকরা বিশেষ করে ধীষণ, পুরন্দর অভিজ্ঞতা তথা প্রত্যক্ষণ নীতির কিছুটা পরিবর্তন করেছিলেন। চার্বাকরা প্রত্যক্ষ নীতির উপর অধিক গুরুত্বারোপ করার জন্য

অনুমানকে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু অনুমানকে অস্বীকার করলে সাধারণ লোকব্যবহারই অসম্ভব হয়ে পড়ে। ধূম দেখে যদি আগুন অনুমান করা অবান্তর বা মেঘ দেখে বৃষ্টির সম্ভাবনা অনুমান করা যদি যথার্থ না হয় তাহলে মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। একারণে পুরন্দর নামক চার্বাক দার্শনিক অনুমানের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেননি। কমলশীল তাঁর *তত্ত্বসংগ্রহ পঞ্জিকায়* লিখেছেন– "পুরন্দরস্ত্বাহ লোক প্রসিদ্ধমনুমানং চার্বাকেরপীষ্যতে এব। যত্তু কৈশ্চিল্লৌকিকং মার্গমতিক্রম্যানুমানসুচ্যত্রে তন্নিষিধ্যত ইতি।"[৩৪] অর্থাৎ পুরন্দরসহ পরবর্তী চার্বাক দার্শনিকগণ লৌকিক অনুমান স্বীকার করার পাশাপাশি অলৌকিক অনুমান অস্বীকৃতির কথা বলেছেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়টিকে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

> ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের নানা নজির অবজ্ঞা না-করলে পুরন্দর নামের দার্শনিককে চার্বাকমতের প্রবক্তা বলে স্বীকার করতে হবে। অতএব পুরন্দরের উপরোক্ত বক্তব্য চার্বাক সম্মত বলে ও স্বীকার করা প্রয়োজন। তাহলে, চার্বাকরা কোনো রকম অনুমানই মানতেন না-এ হেন দাবিকে অত্যুক্তি বলে সন্দেহ করারও কারণ আছে। বরং স্বীকার করা দরকার যে, চার্বাকমতে পরলোকাদির অনুমান অসম্ভব হলেও প্রত্যক্ষগোচর ইহলৌকিক বিষয়ে লোক প্রসিদ্ধ অনুমান স্বীকার্য।[৩৫]

এভাবে চার্বাকরা প্রত্যক্ষনীতির কঠোরতা থেকে বের হয়ে এসে ইহলৌকিক অনুমানকেও প্রমাণের মর্যাদা দিয়েছিল। অন্যদিকে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের সম্পর্কে বলা যায়, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা পরখনীতির প্রবর্তন করে অর্থপূর্ণ ও অর্থহীন বচনের মধ্যে বিভেদ রেখা টানেন। তাঁরা মনে করেন, অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞানের জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব এই নীতির মাধ্যমে খুব সহজেই নিরুপণ করা যায়। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা বলেন, অধিবিদ্যা বা নীতিবিদ্যার ভাষা বা বাক্য পরখনীতির মাধ্যমে সত্য বা মিথ্যা বলে প্রতিপাদন করা যায় না। এজন্য এগুলো সম্পর্কে যে কোনো আলোচনাই অর্থহীন। এয়ার যে নির্ণায়কের মাধ্যমে সোজাসুজিভাবে কোনো উক্তির অর্থপূর্ণতা যাচাইয়ের কথা বলেন তার নাম পরখনীতি।[৩৬] পরখযোগ্যতার মানদণ্ড ব্যবহার করে কোনোটি বাস্তবগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি এবং কোনোটি বাস্তবগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি নয় এই বিষয়ে জানা যায়।[৩৭] কোনো তাৎপর্যপূর্ণ উক্তির সত্য বা মিথ্যা হওয়ার বিষয়টি পরখনীতির সাহায্যে খুব সহজেই নির্বাচন করা সম্ভব। এ কথা বললে অনেক কিছুই যাচাইনীতির ধোপে টেকে না ফলে সেসব বিষয় অর্থহীন হয়ে যায়। বিশেষ করে বিজ্ঞানের অনেক বিষয় বাদ পড়ে যায় ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। প্রত্যক্ষবাদীরা তাঁদের এই কঠোর নীতি থেকে সরে আসেন এবং পরবর্তীতে উদারনীতি গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সমালোচনার জবাব দেওয়ার লক্ষে তাঁরা কঠোর নীতির পরিবর্তে উদারনীতি গ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের মতবাদকে গ্রহণযোগ্য মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

ইতোমধ্যে আমরা চার্বাক দর্শন ও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ আলোচনা থেকে দেখা যায় চার্বাক দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক বক্তব্যের সাথে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক বক্তব্যের কোনো বিরোধ নেই। এ কথা খুব স্পষ্ট যে, এ দুটি

দর্শন ভিন্ন সময়ের ও ভিন্ন স্থানের হলেও তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে যে সামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করেছি সেটা খুবই প্রশংসনীয়। চার্বাক দর্শন অতি প্রাচীনকালের দর্শন সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৭০০ অব্দেরও পূর্ববর্তী সময়ের দার্শনিক সম্প্রদায়। অথচ তাঁদের দার্শনিক চিন্তার সূত্র অতি সাম্প্রতিককালের যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের দর্শনেও পাওয়া যায়। এ কারণে চার্বাক সম্প্রদায়ের দর্শন চিন্তাকে কোনোভাবেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। সম্ভবত প্রাচীনকালের এই দর্শন সর্বসাধারণের কাছে অধিক জনপ্রিয় ছিল।

চার্বাকরা প্রত্যক্ষণকে জ্ঞানের অন্যতম উৎস বলে মনে করতেন এটা জোরালোভাবে বলা যায়। অন্যদিকে, যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দর্শন সাম্প্রতিককালের হওয়ায় এ বিষয় সম্পর্কিত অনেক লিখিত গ্রন্থ ও বক্তব্য আমাদের সামনে উপস্থিত আছে। ফলে তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক নীতিটি আমাদের কাছে স্পষ্ট। অভিজ্ঞতা নির্ভর জ্ঞানের সাহায্যে চার্বাকরা, যেমন অতীতের সাধারণ মানুষকে ভাববিলাসী বা কল্পনা প্রবণ হওয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছিলেন, তেমনি যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা দর্শন থেকে সকল প্রকার অধিবিদ্যক বিষয়কে বাদ দিয়ে যথার্থ দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পূর্ববর্তী সময়ে তৎকালীন সমাজ ভাববাদী চিন্তাধারা দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, যা মানুষের সমস্ত সৃজনশীলতা ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করেছিল। এসব ভাববাদী চিন্তাধারা থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক ও নিশ্চিত জ্ঞান অর্জনের আন্দোলন করেছিলেন যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা। এজন্য বলা যায়, উভয় দর্শনই সময়ের প্রয়োজনে যে জ্ঞানতাত্ত্বিক নীতি অবলম্বন করেছিলেন সেটা যতটা না জ্ঞানতাত্ত্বিক আন্দোলন তার চেয়ে বেশি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে পরিচিত ছিল। তাঁদের নীতির প্রভাব পরবর্তী প্রায় সকল দার্শনিক ধারার মধ্যে লক্ষ করা যায়। চার্বাক ও প্রত্যক্ষবাদীদের জ্ঞানতাত্ত্বিক নীতি যদিও সমালোচিত হয়েছিল তবুও দর্শনের ইতিহাসে, বিশেষ করে জ্ঞানবিদ্যার ইতিহাসে উভয় দর্শনের অবদানকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। এজন্য তাঁদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আন্দোলনটি দর্শনের ইতিহাসে একটি অন্যতম আন্দোলন হিসেবে বিবেচিত।

তথ্যসূত্র

১. Radhakrishnnan, S., (ed.), *History of Philosophy: Eastern and Western*, Vol.1, London, George Allen and Unwin Ltd., 1952, p. 134.

২. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M, *An Introduction to Indian Philosophy*, University of Calcutta, Eighth Reprint endition, 1984, p. 56.

৩. রাসবিহারী দত্ত, *ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ খণ্ডন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ৭০০ ০১৩, পৃ. ২২৭।

৪. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন*, অখণ্ড সংস্করণ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৬৩, পৃ. ৫১।

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১।

৬. রাসবিহারী দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১।

৭. ডক্টর কালী প্রসন্ন দাস, *ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা: চার্বাক ও হিউম*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ. ৪৭, (উদ্দয়ঠাকুর, *ন্যায়বার্ত্তিক*, কলিকাতা, বিবলিওথিকা ইন্ডিকা, ১৮৮৭, ১.১.৪।)

৮. C.D. Bijalwan: *Indian Theory of Knowledge*, New Delhi, Heritage Publishers, 1977, p. 67, (ডক্টর কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭,)।

৯. লতিকা চট্টোপাধ্যায়, *চার্বাক দর্শন*, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, ৭৩, পৃ. ৭০।
১০. রাসবিহারী দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২।
১১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, অনুষ্টুপ, ২ই নবীনকুন্ডু লেন, কলকাতা, ৭০০ ০০৯, পৃ.৪৩।
১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪।
১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।
১৪. J.N. Sinha: *A History of Indian Philosophy*, vol. 1, Calcutta, Sinhan Publishing House, 1956, p. 777 এবং S.N. Das Gupta: *A History of Indian Philosophy*, New York, Cambridge University Press, 1969, vol. 1, p. 378, (ডক্টর কালী প্রসন্ন দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬)।
১৫. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।
১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮।
১৭. Chatterjee, S.C. and Datta, D.M, *op.cit.*, p. 60.
১৮. ড. আমিনুল ইসলাম, *সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৮৯/এপ্রিল ১৯৮২, পৃ. ৩৫৪।
১৯. মতিউর রহমান, "নৈয়ায়িক দৃষ্টবাদ ও অধিবিদ্যার ভাষা", *বাংলা একাডেমি পত্রিকা: বৈশাখ-আষাঢ়*, ১৩৯২, পৃ. ৯০।
২০. সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার, *দর্শন শিল্প ও সমাজ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২৯।
২১. গালিব আহসান খান, *বিজ্ঞান পদ্ধতি ও প্রগতি*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২৩।
২২. সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন, *সমকালীন দর্শনের কয়েকটি ধারা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১০০০, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় ১৪০৬/জুন ১৯৯৯, পৃ. ১২৫।
২৩. গালিব আহসান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।
২৪. ড. আমিনুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৭।
২৫. গালিব আহসান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫।
২৬. ড. মোঃ আব্দুল মুহিত, *ভাষা দর্শন*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১২, পৃ. ৭১।
২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩।
২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪।
২৯. মোঃ নূরুজ্জামান, "যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ, মিথ্যায়ন নীতি ও বিজ্ঞান", সমাজ নিরীক্ষণ, নং-১০৫, এপ্রিল-জুন ২০০৮, পৃ. ২৬।
৩০. রাসবিহারী দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১।
৩১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১-১৪২।
৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬।
৩৩. মতিউর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫।
৩৪. রাসবিহারী দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩।
৩৫. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩।
৩৬. Ayer, A.J., *Language, Truth and Logic*, London, Victor Gollangz Ltd., 1967, p. 5.
৩৭. মোঃ নূরুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭।